অন্তবিহীন পথ চলাই জীবন : নচিকেতা চক্রবর্তী

সুদীপ্তা তরফদার

সুমন না নচিকেতা, কার গান বেশি নাড়া দেয় — এমন একটী ছেলেমানুষি বিতর্ক ভেসে থাকত আমাদের যৌবনবেলার দিনগুলোতে। ৯৩-৯৪-এর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের হলিডেগুলো ছিল সেই বিতর্কের ক্ষেত্র। মণীশ-সব্যসাচীরা সুমনকে নিয়ে এল। মঞ্চে উঠে সিন্থেসাইজার বাজিয়ে উদাত্ত গলায় গান ধরলেন সুমন,

এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই
ডাইনে ও বাঁয়ে আমি তোমাকে চাই...
অবাধ্য কবিতার ঠুংরি-খেয়ালে
স্লোগানে স্লোগানে ঢাকা দেয়ালে দেয়ালে
সলিল চৌধুরীর ফেলে আসা গানে
চৌরাশিয়ার বাঁশি-মুখরিত প্রাণে...
তোমাকে চাই

ঐ সময়ের ছাত্রনেতা থেকে সাধারণ মানুষ— সকলেই এ গানে পেয়ে গেল নিজের চেনা মুহূর্তগুলোকে। এ গান হয়ে উঠল এক অনবদ্য পারফরমেন্স। কিন্তু প্রতিপক্ষ থেমে রইল না। তাল ঠুকে নেমে পড়ল কৌশিক-কল্যাণ- তাপসরা। এলেন নচিকেতা। মঞ্চে উঠে শরীরী ভাষা নিয়ে নচিকেতা উগরে দিলেন আমাদের যৌবনের নিষ্ফলতাকে,

শুধু বিষ শুধু বিষ দাও অমৃত চাই না...
জীবনকে যদি দাও নীল বিষাক্ত চোখ
থাকবে না ক্ষোভ
আমার মৃতদেহে ঝুলবে নোটিশবোর্ড
কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুমনের রোমান্টিক ভরাট গলায় সেদিনের যৌবন তার আশা-ভালোবাসার সঙ্গে পেল হতাশা আর প্রতিবাদকেও। সে ভালোবাসা কিংবা প্রতিবাদ সব কিন্তু ভীষণ স্মার্ট, ঝকঝকে; অ্যাকাডেমি-নন্দনের মতো শহুরে শিক্ষিত যৌবনের শোভন প্রকাশ। অন্যদিকে নচিকেতা তাঁর গানের লিরিক, সুর, পরিবেশনার শরীরী ভঙ্গী নিয়ে যৌবনের পেলব ইনোসেন্সকে আছড়ে ভেঙে দিলেন ব্যঙ্গ বিদ্রূপে। সেখানে সিলিঙ-এর বন্ধনে দোলে কৈশোরের প্রেম 'নীলাঞ্জনা', 'শিশুদের শৈশব চুরি' যায়, চুরি যায় ;'মূল্যবোধ', রোজ রাতে হাতবদলানো মেয়ের অভিশাপে দগ্ধ হয় জীবন, আর 'হাসপাতালের বেডে টিবি রোগীর পাশে খেলা করে শুয়োরের বাচ্চা।' ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেল এমন ভয়ঙ্কর নৈরাশ্যবাদী উচ্চারণ একই সময় সুমনের প্রায় বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দিল নচিকেতাকে।

বাংলা গানে নব্বই-এর দশক তাই বাঁক বদলের চিহ্ন তৈরি করল সুমন-নচিকেতার গানে। গীতিকার নচিকেতার আলোচনায় ঢুকে পড়ার আগে আমরা বুঝে নেব বাঁক বদলের প্রশ্নটিকে। রবীন্দ্রসমকালীন বাংলা গানের জগতে অনেকদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রপ্রতিভা নামক নক্ষত্রের আলো ঢেকে রেখেছিল অন্যান্য জ্যোতিষ্ককে। তবুও দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তরা বাঙালি শ্রোতার মনের জগতে আনাগোনা করতেন। এমনকি, নজরুলের গানেও বাঙালি পেয়েছিল এক অন্য ঘরানার পরিচয়—প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের পাশে নজরুল এনেছিলেন গজল নামে এক ভিনদেশী পাখির গান। গজলের অনন্য মাদকতায় বাঙালি আজও যে আচ্ছন্ন—গোলাম আলি, জগজিৎ-কৃষ্ণার গানের জনপ্রিয়তা তার প্রমাণ।

চল্লিশের দশকে গণনাট্য সংঘ ও গণসংগীতের রমরমার যুগে আমরা পেয়ে গেলাম সলিল চৌধুরীকে— বাংলা গানের বাউল বাতাসে সত্যিই ঝড় তুললেন সলিল। রবীন্দ্র, নজরুলের পরেই একই সঙ্গে গীতিকার - সুরকার প্রতিভা সলিলের মধ্যেই আধুনিক বাংলা গানের জগতকে এক নতুন অভিমুখে চালিত করল। সলিলের পাশাপাশি আমরা পাঁচ থেকে আশির দশকের মধ্যে পাচ্ছি আরও কয়েকজন অসামান্য গীতিকারকে যেমন- সুধীন দাশগুপ্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা। পেয়ে যাচ্ছি হেমন্ত-মান্না-সতীনাথ- দ্বিজেন-ধনঞ্জয়-শ্যামল মিত্র-গীতা দত্ত-লতা-আশা-সন্ধ্যা-নির্মলা মিশ্রদের। একই সঙ্গে গীতিকার, সুরকার এমন বেশ কিছু সংগীতশিল্পীকেও উঠে আসতে দেখলাম লাইমলাইটে। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে হঠাৎ করে যখন বলা হল — সুমন-নচিকেতারা যে গান গাইছেন — তা 'জীবনমুখী গান' তখন সলিল থেকে শুরু করে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অজিত পান্ডে, শুভেন্দু মাইতি, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়দের (এ তালিকা অসম্পূর্ণ এবং মনে রাখতে হবে যে, আমরা মূলত গীতিকারদের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব) সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হবে।

পাঁচের দশকে সলিল চৌধুরী গণসংগীতের ধারাটি থেকে সরে এলে বাংলা গান আরও উপকৃত হল। পঞ্চাশের দশক থেকে বহু অমর বাংলা গান ও গায়ককে আমরা

পেয়েছিলাম সলিল চৌধুরীর হাত ধরে। 'কোনো এক গাঁয়ের বধূ' র মতো গান তো সলিলেরই সৃষ্টি যে গান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অমর গানগুলির অন্যতম। গণসংগীতের পর দুটি ধারাতেই সলিল গান রচনা ও সুর করেছেন। একটি— চাঁদ-ফুল-পাখির কুজনে ভরা প্রেমের, অন্যটি — খেটে খাওয়া শোষিত মানুষের জীবনের। এবং বলা বাহুল্য দুটি ধারাতেই তিনি সুপারহিট। দুঃখের বিষয়, বাংলা গানের ধারাবাহিক ইতিহাস আজও লেখা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি প্রতিদিন 'রোববার' এর 'হারমোনিয়াম' কলামে সুমন ও সুপ্রিয়ের গবেষণায় ধারাবাহিকভাবে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সলিলের গান ও সুরের কম্পোজিশনের অসাধারণ ইতিহাস।

'কোনো এক গাঁয়ের বধূ' কিংবা 'আমার প্রতিবাদের ভাষা/ আমার প্রতিবাদের আগুন' অথবা 'এই রোকো পৃথিবীর গাড়িটা থামাও'— সলিল চৌধুরীর এইসব গান তিনি যদি নিজেই একটা গীটার হাতে করে স্টেজে উঠে গাইতেন — তবেই কি আমরা তাকে;জীবনমুখী' বাংলা গানের স্রষ্টা বলতাম? এই প্রশ্ন চলে আসে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, অজিত পান্ডে, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও। এমনকি সুমন-নচিকেতা-অঞ্জনরা যে পাশ্চাত্য প্রভাবকে বাংলা গানের সুরে স্বীকার করে নিয়েছেন — তাও এই পূর্বসুরীদের গানে অনায়াসে পেয়ে যাই। সলিল এই গানটিতে ব্যবহার করেছেন জ্যাজের সুর। প্রতুল 'ছোকরা চাঁদ জোয়ান চাঁদ'-এ ব্যবহার করেছেন আফ্রিকার লোকসংগীতের সুর। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পিট সিগারের 'হোয়ার হ্যাভ অল দ্য ফ্লাওয়ার্স গন' গান থেকে লিখেছেন 'ফুলগুলি সব কোথায় গেল' — আর এই একই গান ভেঙে সুমন পরে লিখবেন 'কোথায় গেল তারা'। ষাট-সত্তরের উত্তাল সময় থেকে বাংলা গানের জগতে এক ধরনের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। বাংলা গানের একঘেয়েমি দুর করতে কেউ কেউ বিখ্যাত কবিদের বিখ্যাত কবিতাকে অবলম্বন করলেন। বেহালায় 'মহীনের ঘোড়াগুলি' নামের শিল্পীরা অর্থাৎ ফকির রঞ্জনপ্রসাদ বা গৌতম চট্টোপাধ্যায় কিংবা প্রতুল মুখোপাধ্যায়রা এই ধারায় জনপ্রিয়। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ন্যাংটো ছেলে আকাশে' প্রতুলের সুরে আজ এই একুশ শতকেও শ্রোতাদের ভাবায়,

ন্যাংটো ছেলে আকাশে হাত বাড়ায়
যদিও তার খিদেয় পুড়ছে গা
ফুটপাতে আজ লেগেছে জোছনা
চাঁদ হেসে তার কপালে চুমু খায়
লুকিয়ে মোছে চোখের জল মা।

একই লাইন বার বার গেয়ে প্রতুল এ কবিতায় সৃষ্টি করেন এক অসামান্য মুহূর্ত; আমরা কাঁদতে ভুলে যাই। প্রতুলের আর একটি গান এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে,

ছোট ছোট দুটো পা ছোট দুই হাত

দু-টাকায় খেটে খায় ভোর থেকে রাত।

... ...

এক নয় দুই নয় দুশো দশ লাখ,
দুশো দশ লাখ শিশু খাটে প্রাণপাত।
শিশুমেলা শিশুদিন শিশু বৎসর
কত মধুমাখা বুলি কত ছাপা অক্ষর
আলো ঝলমল সভা ভাবের জোয়ার
তবু ভবিষ্যতের খাটে ভূতের বেগার
এ মহাভারত দাদা এ মহাভারত
মাছের মতই আছে শিশুর আড়ত।
জ্বালানীর মতো আছে শিশুর জোগান
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

এ গান কী নচিকেতার 'শৈশব চুরি যাওয়ার' মতো গানের ক্ষেত্র রচনা করে না ?
আবার গৌতমের গানে যখন আমরা দেখি মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চরিত্র,

আমি ডান দিকে রই না, আমি বাম দিকে রই না
আমি দুই দিকেই রই
পরান জলাঞ্জলি দিয়ারে।

তখনও কী মনে হয় না সুমন-নচিকেতারা তার দুই দশক পরেই একই আপোসের কথা বলবেন তাদের গানে। সুতরাং রাবণের সিঁড়ি গড়া সম্ভব নয় কোনো ভিত ছাড়া। স্বাধীনতা-পরবর্তী চার দশকের বাংলা গানের নানা ওঠা-পড়া আর গ্রহণ বর্জনের মধ্যেই গড়ে উঠেছে সুমন-নচিকেতাদের বাংলা গান।

তাহলে দেখা গেল স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা গানে গণনাট্য সংঘের হাত ধরে যে দিকবদল ঘটেছিল তাতে সলিল থেকে প্রতুল সকলেরই নানা অবদান রয়েছে। জীবন সংগ্রামের কথা, আন্দোলনের কথা, হতাশার কথা এঁদের লেখা গানে যেমন এসেছে, তেমনি এঁদের নানা সুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বাংলাগানকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মাত্রা। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, এই ক্ষেত্র যদি ছিলই তবে সুমন-নচিকেতারা কি এমন নতুনত্ব আনলেন যাতে বাংলাগানের শ্রোতারা আন্দোলিত হলেন?

নব্বই-এর দশকে এসে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, এখান থেকে বাঙালি জীবনসঙ্গী করে নিল বিশ্বায়নের মন্ত্র। বাঙালি আপন করে নিল অর্ধেক ইংরাজি, অর্ধেক বাংলা মেশানো বাংলাভাষাকে। এল মোবাইল-ইন্টারনেট-কালার টিভি-কেবল কানেকশন-টিভির গেম শো, রেকর্ড থেকে এসে পড়ল ক্যাসেট এবং সিডি। বাঙালি জীবনের বিনোদনে অনেক বেশি জায়গা করে নিল যে কোনো উৎসবে ম্যারাপ বেঁধে ফাংশান। কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গীটার হাতে কাঁপাতে শুরু করল ক্যাম্পাস।

মনে রাখতে হবে, চন্দ্রবিন্দুর উপল - অনিন্দ্য- চন্দ্রিলরা এর কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যান্ডের গান এনে ফেলবেন কলেজের ফাংশনে। নিজেদের কথা নিজেদের মতো করে বলব, মানব না কোনো গতে বাঁধা রীতি— এমন একটা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র হাঁ করেই ছিল। সেখানেই সুমন বা নচিকেতারা নেমে পড়লেন বেনিয়মের মন্ত্র, উচ্চকণ্ঠ আর শরীরী ভাষা নিয়ে। ফলে এলেন-দেখলেন-জয় করলেন। আর বাঙালি শ্রোতা-দর্শক এসে পড়লেন 'অন্য গানের ভোরে'।

সুমন-নচিকেতার গানের বাঁকবদলের বৈশিষ্ট্য খুব সুন্দর ধরা পড়েছে কাজী কামাল নাসেরের একটি গানে,

কেউ নেমেছেন গীটার হাতে কেউবা হারমোনিয়াম
নতুন দিনের বাংলা গানে করবে যা তাই নিয়ম
কেউ নেমেছেন খালি হাতেই কণ্ঠ করে সঙ্গী
হাততালি আর তুড়ির সঙ্গে দারুণ অঙ্গভঙ্গি।
যে যার গানটা নিজেই লেখেন সুরটাও দেন খাসা
এঁদের হাতেই এ গান আবার পাচ্ছে খুঁজে ভাষা।
এঁদেরই কেউ বলেন প্রথম, দারুণ মনের জোরে—
'দেখা হবে তোমার আমায় অন্য গানের ভোরে'।

এমন গানের পরিবেশে কোনো ঢাক ঢাক গুড়গুড়ের পক্ষপাতী নন নচিকেতা চক্রবর্তী। বাঙালি শ্রোতাকে ছুঁড়ে দিলেন চ্যালেঞ্জ। ফুল হাতে নিয়ে কিংবা দামি রেস্তোরাঁয় চাউমিন খাওয়ানোর শর্ত নিয়ে তিনি প্রেম নামক বিধিবদ্ধতায় বাঁধা পড়তে নারাজ। তাই বললেন অ্যান্টিরোমান্টিক (পড়ুন অন্যরকম রোমান্টিক) ভাষায়,

এই তুমি কি আমায় ভালোবাস?
যদি না বাস তবে পরোয়া করি না
আমি সূর্যের থেকে ভালোবাসা নিয়ে
রাঙাবো হৃদয় তার রঙ দিয়ে
পোশাকি প্রেমের প্রয়োজন বোধ করি না।

বিশ্বায়নের যুগের প্রেমিক-প্রেমিকা ন্যাকা ন্যাকা প্রেমের বাণীর বদলে নচিকেতার গানকে তুলে নিল কণ্ঠে,

আমি তোমার জন্য শস্তা প্রেমের
নাটুকে নায়ক পারব না হতে পারব না
যখন আমার ঘরেতে আঁধার
নেই এক ফোঁটা কেরোসিন
পাওনাদারের অভিশাপ শুনে
জেরবার হয় বুড়ো বাপ
আমি তো তখন পারব না খেতে

চাইনিজ বার-এ চাওমিন।

কারণ, এ যুগের ছেলেমেয়েরা কাড়াকাড়ি করে একে অন্যের শালপাতা থেকে ঠুকরে নেয় — আলু কাবলি আর চুড়মুড়, জিভ দিয়ে চেটে নেয় গলে পড়া একটাই আইসক্রীম, চুমু খেতে পারে রাস্তার ট্রাফিক সিগনালে, আর 'হাতে হাত ধরে হেঁটে যায় দূরত্ব আর আকাশকে উপেক্ষা করে'।

এই স্টাইলটাই মিথ করে তুলল একদিকে সুমন, অন্যদিকে নচিকেতার গানকে। বলা বাহুল্য, নচিকেতার গানে আমরা পেলাম বেশিমাত্রায় বোহেমিয়ানিজম অর্থাৎ চালচুলোহীন উদাসীন এক স্বর। সুমনের গানে যে ধ্রুপদী চেতনা এবং রোমান্টিক ভাবালুতা গানের গহনে অন্তর্লীন থাকে তা নচিকেতার লেখা গানে বা সুরে নেই। ফলে সুমন যেভাবে বা যে মেজাজে গানের লিরিক বা সুর নিয়ে ভাবেন, নচিকেতা সেই পথে চলেন না। তাই অমার্জিত শব্দরা জায়গা করে নেয় — নচিকেতার গানে। 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা'র পাশেই তিনি অনায়াসে উচ্চারণ করেগ,

> হাসপাতালের বেডে টিবি রুগীর পাশে
> খেলা করে শুয়োরের বাচ্চা।

বাংলা কবিতায় - এরকম অমার্জিত শব্দোচ্চারণ অবশ্য হাংরি আন্দোলনের কবিরাও শুনিয়েছেন। তবে নচিকেতার সুর সংযোজনা এরকম শব্দোচ্চাণকে আলাদা স্তরে নিয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের 'একদিন' পত্রিকার রবিবারোয়ারি সংখ্যার (২৭ মার্চ, ২০১৬) একটি সাক্ষাৎকারের কথা,

> ব্রেখট বলেছেন, বিষয়টা এলিয়েনেট করে, বৈচিত্রপূর্ণ করে বলো। উৎপল দত্ত বলতেন, থিয়েটার করার সময় দেখতে হবে, শেষ সিটের দর্শকের ঝিম লেগে গেল কিনা। ঝিম কাটাতে, সজাগ করতে উনি নাটকে খিস্তি ব্যবহার করতেন। সেই ধাক্কা, মজা, সারকাজম গানেও আনতে হয় — সামনের লোকটাকে বলতে, শোনাতে। কেউ শুনে রান্না ছেড়ে চলে এলেন গান শুনতে, অর্থাৎ গান শুনে সব ভুলে কাজ ছেড়ে চলে আসছেন, ভাবো। এটা খুব দুরূহ কাজ।

এখানে তিনি গানের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা জাগানোর স্টাইলের কথা বললেন। একই সংখ্যাতে শান্তনু মৈত্রও বলেছেন গানের মাধ্যমেই নীরবে যে প্রতিবাদ করা সম্ভব তা দেখিয়ে দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হোক কলরব'-এর দৃষ্টান্ত। নচিকেতার গানে আমরা বাংলা গানের সেই প্রতিবাদী মেজাজটাকে হাড়ে হাড়ে চিনতে পারি।

বাংলা গানের লিরিকে কবিতার মেজাজ প্রতুল-গৌতম-রঞ্জন প্রসাদরাই এনেছিলেন। গানের প্রথাগত স্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারীর প্রয়োগকেও তারা কুর্ণিশ করেন নি। সুতরাং নচিকেতার গানে এটা নতুন আঙ্গিক নয়। তাঁর 'নীলাঞ্জনা' সিরিজের গানগুলি

কবিতা হিসেবেও অসাধারণ। 'নীলাঞ্জনা'র প্রথম অংশটুকুর পর তিনি সুরের পরিবর্তে যেভাবে মুডের পরিবর্তনকে ধরেন তা অসামান্য মাত্রা পায় যখন বলেন,

এরপর বিষণ্ণ দিন
বাজে এ মনোবীণ—
অবসাদে ঘিরে থাকা
সে দীর্ঘ দিন।
হাজার কবিতা
বেকার সবই তা

নীলাঞ্জনা সিরিজের দ্বিতীয় গানটিতে আমরা পাই,

দুলছে হাওয়ায় না না ফুল নয়
দক্ষিণা বাতাসে নাগপাশে সময় নয়
খোলা বারান্দায় এ নির্জনতায়
সিলিঙ এর বন্ধনে মাটির ব্যবধানে
দুলছে স্খলিতবসনা নীলাঞ্জনা...

গানের কথাগুলোয় রবীন্দ্র-সমকালীন বাংলা আধুনিক কবিতায় দুঃখবাদী কবি নামে পরিচিত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কেতকী' কবিতাটির কথা মনে পড়ে যায়।

নচিকেতার গানের লিরিক কতটা কবিতা হয়ে উঠেছে একথা অনেকের সমালোচনায় উঠে আসে। অমার্জিত শব্দ ব্যবহার ততটা তাঁর বিরুদ্ধে যায় না, যতটা যায় কোনো কোনো গানে একগাদা সমস্যাকে ঘুলিয়ে তোলায়। অনেক সময় বিষয় নির্বাচন করতে গিয়ে তিনি ঘুলিয়ে ফেলেন মূল লক্ষ্যটিকে। যেমন, একটি জনপ্রিয় গান শুরু করেন অসাধারণ র‍্যাপের ভঙ্গীতে,

মন দিয়ে লেখাপড়া করে যেই জন
বড়ো হয়ে গাড়িঘোড়া চড়বে সে জন
... ...
একটি ছোট্ট কথা ম্যানুপুলেশান
এরপর পড়ে থাকে ভর্তির পরীক্ষা
ছেলে নয় মা-বাবার অগ্নি পরীক্ষা
চুকে যায় জীবনের দাম্পত্যের সুখ
গ্রাম দেশে বিয়ে করা বাবা আনে হাতে ধরা
মায়েদের জন্য ইংরেজি ওয়ার্ডবুক
তিনজনে শিক্ষিত হতে চায় রাতারাতি
শিক্ষাই সত্যি তলোয়ার প্রাণঘাতী।

কিন্তু এ গানের শেষে তিনি প্রশ্ন করেন,

যে শিশু জন্ম নিল শিক্ষার বহু দূরে
শিক্ষা কি আলো দেয় তার কালো মুখ ভরে?

এক সমস্যা থেকে গান চলে যায় আর এক সমস্যায় যার শেষ এ গানে মেলে না। এ গানটির আর একটি বিশেষত্ব আছে। নচিকেতা নিজেই 'অনির্বাণ' নামে গানের সংকলনে বলেছেন এ গানটির সুরে র‍্যাপের প্রভাবের কথা। 'র‍্যাপ' হল শেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতিবাদ-আন্দোলনের ছন্দ। wikipedia তে র‍্যাপের সম্পর্কে বলা হয়েছে — **Rapping means spoken or chanted rhyming lyrics. Its means flow of content.** ছড়া আর র‍্যাপ মিলিয়ে নচিকেতার আরও একটি গান,

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ি
শ্বশুরবাড়ি ভারি মজা
শ্বশুরবেটার মাথায় বোঝা
... ...
মনের ডাক্তার জোগাড় করে
শুধছে সে তার বছর ধরে
গোদের উপর বিষের ফোড়া
জামাইষষ্ঠীর ইলিশ জোড়া...

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া র‍্যাপের সুরে 'কুটুসকুটুস মট্টর ভাজা/ খাচ্ছেন নিবুচন্দ্র রাজা' গানটি অনেক আগেই কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি। তাছাড়া খাঁটি র‍্যাপের দৃষ্টান্ত নচিকেতার গানে নেই। বরং বলা যেতে পারে, 'র‍্যাপের কন্টেম্পোরারি' ফর্ম নচিকেতার মধ্যে মেলে। বর্তমানে র‍্যাপের জগতে হানি সিং খুবই ভালো কাজ করছেন। অন্যদিকে মিকা সিং র‍্যাপের সঙ্গে মেলোডিকে মিলিয়ে নিয়ে আর এক ধরনের আবেদন তৈরি করছেন। নচিকেতার গানের প্রসঙ্গে অরুণ বসু এ গানটিতে অ্যাপাচি ইন্ডিয়ানদের প্রভাবের কথা বলেছেন। এদের জনক স্টিভেন কাপুর নামে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যিনি পাঞ্জাবে জন্মেছিলেন। একই সঙ্গে আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে ইনি র‍্যাপ নিয়ে কাজ করছেন। ইন্দো-জামাইয়ান-আমেরিকান ভোকাল স্টাইল এই শিল্পীর গানের বৈশিষ্ট্য। এর ঘরানার শিল্পীরা অ্যাপাচি ইন্ডিয়ান নামে খ্যাত। নির্ভেজাল র‍্যাপে তারের বাদ্যযন্ত্র বা সুরবিস্তারি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয় না। পাখোয়াজ, ড্রামের মতো বাদ্যযন্ত্রে রিদিম রাখা যেতে পারে। কিন্তু নচিকেতা যেটা করেছেন — র‍্যাপে গ্রাম্য কথকতার একঘেয়েমি সুরটিকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে কাজে লাগাচ্ছেন।

নচিকেতার আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান তাকে 'কুলীন সংগীতবিক্রেতা' করে তুলেছে। যেমন বৃদ্ধাশ্রম গানটি আমাদের সময়ের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির উদাসীনতাকে ভয়ঙ্করভাবে লজ্জায় ফেলে দেয়,

ছেলের আবার আমার প্রতি
অগাধ সম্ভ্রম
আমার ঠিকানা তাই

বৃদ্ধাশ্রম।

'এই বেশ ভালো আছি' গানটিতে স্পর্শকাতর মানুষের আপোষ করে চলার বেদনা অনন্য ভাষ্যরূপ পেয়েছে। 'অনির্বাণ' সিরিজের গানগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত। আবার 'স্বাধীনতা', 'খ্যাদা নাক কালো রঙ' কিংবা 'বারো টাকার দেহপসারিণী'র গান বিষয়বস্তু ও বলার ভঙ্গীতে আধুনিক মানুষের আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করে। 'সরকারি কর্মচারী' গানটি আমাদের কর্মসংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে ভয়ঙ্কর ভাবে,

বারোটায় অফিস আসি
দুটোয় টিফিন
তিনটেয় যদি দেখি সিগন্যাল গ্রিন
চটিটা গলিয়ে পায়
দুপাক খেয়ে দ্বিধায়
চেয়ারটা কোনো মতে ছাড়ি।
... ...
চারটেয় চলে আসি বাড়ি
আমি সরকারি কর্মচারী।

নচিকেতার 'পাগলা জগাই' নামে ট্রাকের হেল্পারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার যে গান আমরা পাই তা তার প্রতিভার পাশাপাশি সমাজমনস্কতাকেও প্রমাণ করে। সুমনের 'পেটকাটি চাঁদিয়াল' গানটির মতোই এ গানের মূল চরিত্র পাগলা জগাই বাধ্য হয় এমন পেশাকে বেছে নিতে যা তার মনের ছবিতে ছিল না,

দুপুরে গাছের ছায়া ফেলে আসা মোহমায়া
ঝাঁক বাঁধে জগাই এর চোখে
জগাই তবুও হাসে নেশা করে অবকাশে
তারা গোনে আনন্দে শোকে...
জগাই নির্বিকার আকাশটা চোখে তার
পিছু ফিরে দেখা ভাবনার নেইকো বালাই...

নচিকেতা এই চরিত্রটির মতো হওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করে শ্রোতাদের কাঁদায়, একই ইচ্ছের শরিক করে নেয়। নচিকেতার এই ধরনের গানগুলোর সঙ্গে বিষয়বস্তুতে না মিললেও 'তুমি আসবে বলে' গানটি বাঙালির জীবনে মিথ হয়ে উঠেছে,

তুমি আসবে বলে অন্ধকানাই বসে আছে
গান গায় নি।
তুমি আসবে বলে চৌরাস্তার পুলিশটা
ঘুস খায়নি।...

আমরা নচিকেতার 'যখন সময় থমকে দাঁড়ায়/ নিরাশার পাখি দুহাত বাড়ায়' গানটিতেও নিজেদের হতাশার কথাই খুঁজে পাই যা অনুরণন রেখে যায়।

দুঃখবাদী কবি নামে পরিচিত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পরবর্তী জীবনে দুঃখবাদের আড়াল ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছিলেন। নচিকেতাও আগের উদ্দামতা থেকে অনেক শান্ত হয়েছেন। তাঁর কোনো কোনো গানে ধ্রুপদী মেজাজও টের পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দি এবং বাংলা সিনেমায় তিনি প্লেব্যাক করছেন, অন্যের লেখা গান গাইছেন। এমনকি 'পত্রভারতী' থেকে তাঁর লেখা ছোটগল্প, উপন্যাস (ক্যাকটাস্, জন্মদিনের কথা ইত্যাদি), গানের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন দিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন নচিকেতা। তাঁর সময়ের অন্যান্য সহযাত্রীরা, যেমন, অঞ্জন-শিলাজিৎ- তপন-কামাল-পল্লব-নীলাঞ্জন -লোপামুদ্রা-মৌসুমিরাও সময়ের সঙ্গে নিজেকে পাল্টে নিচ্ছেন। সুমনের গানেও আমরা অনেক গবেষণার চিহ্ন পাচ্ছি। বাঙালি শ্রোতা নচিকেতার কাছ থেকে আরো কিছু পাওয়ার দাবী রাখে। কারণ সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলাতে হয়। সুমনও বলেছেন নিজের গানে 'চাটুজ্যে তোর সন্ধি করার বয়স হল।' নচিকেতাও বলেন,

আজ আমি নচিকেতা
কুলীন সঙ্গীত বিক্রেতা
কাল হরিজন
আসলে আর এক ঢেউ
দেখবে না ফিরে কেউ
বলবে গাইতো গান, এখন সে...

গ্রন্থঋণ :

১. শারদীয়া আজকাল (১৪১০)
২. চারদশকের বাংলা গান : অরুণ সেন ও গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
৩. প্রতিক্ষণ পত্রিকা (মার্চ ১৯৯৮)
৪. সলিল থেকে সুমন এবং তারপর : অরুণ কুমার বসু, সৃষ্টি প্রকাশন।
৫. একদিন : রবিবারোয়ারি, ২৬ মার্চ, ২০১৬।